# ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত দার্শনিক যুক্তিসমূহ খন্ডন

অ ন ন্ত

ananta@inbox.com

২৮শে অক্টোবর, ২০০৬

- - - - - - - - -

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর .....

## (২) উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণ (Teleological Argument) :-

আমাদের এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে রচিত অন্যান্য যুক্তি/ প্রমাণসমূহের মধ্যে উদ্দেশ্যবাদী মতবাদটি ধর্মীয় দার্শনিকগণসহ আপামর জনসাধারণের কাছে খুবই জনপ্রিয় এবং প্রাচীনতর। কারণ এটি বেশ সরলতম ও মনযোগ আকর্ষক, তাই এটি সর্বসাধারণের কাছে সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য!! উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণ বা **Teleological Argument** এর "**teleos**" শব্দটি মূলত গ্রীক ভাষা থেকে আগত। গ্রীক ভাষায় যার অর্থ "**Goal**", "**Purpose**" বা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। দর্শনের ইতিহাসে এ যুক্তির প্রবক্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রাচীন গ্রীসের স্টোয়িক (*Stoic*) দার্শনিকগণ, টমাস একুইনাস (***Thomas Aquinas***), জি. উইলহেম লাইবনিজ (***Gottfried Wilhelm Leibniz***), উইলিয়াম প্যালে (***William Paley***), জেমস্ মার্টিনিও (***j. Martineau***) প্রমুখ।

উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণটি (**Teleological Argument**) ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়, আমাদের প্রাকৃতিক জগতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য থেকে অর্থাৎ জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার অস্তিত্ব থেকে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত উদ্দেশ্যবাদীদের মতে, এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা অকারণ ও উদ্দেশ্যহীন নয়, বরং বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এই জগতে নিয়ম শৃঙ্খলার সৃষ্টি, তার আশ্রয়, ও অধিষ্ঠান হিসেবে এমন কোন পরম সত্তা স্বীকার করতে হয়, যা এর স্রষ্টা, নিয়ন্তা বা পরিচালক। ইনি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই হতে পারেন না বলেই ঈশ্বর থাকতে বাধ্য! অনেকে বলে থাকেন, লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আমাদের এ মহাবিশ্বে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কোন আকস্মিক ঘটনাবলীর সমাবেশ কিংবা আপতিক ঘটনাবলীর এলোমেলো সংমিশ্রণ নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল ব্যাপার। গ্রহগুলো তাদের কক্ষপথে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে পরিভ্রমণ করে, পৃথিবীতে ঋতুসমূহের পরিবর্তন ঘটে একের পর এক একই সময়ে, শষ্যবীজের পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে একই নিয়মে। এই যে প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে সুশৃঙ্খল নিয়ম বিদ্ধমান রয়েছে, তা কখনোই আপনা-আপনি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। এর নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই একটি বুদ্ধিমান চেতন সত্তার অস্তিত্ব থাকা চাই। এই বুদ্ধিমান চেতনা থেকে একজন পরিকল্পনাকারী বা স্থপতির অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যায়।

গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফোন (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০-৩৫০) উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত কিংবদন্তিতুল্য দার্শনিক সক্রেটিসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) একটি উক্তি : "**with such signs of forethought in the design of living creatures, can you doubt that they are the work of choice or design?**" অর্থাৎ প্রাণময় সৃষ্টির মধ্যে এমন পূর্বকল্পিত চিহ্নের

অস্তিত্ব সত্তেও আপনি কেমন করে সন্দেহ পোষন করেন যে এরা পছন্দকৃত বা নক্সাকৃত কার্যের ফসল?

সক্রেটিসের সুযোগ্য ছাত্র দার্শনিক প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) ও ভেবেছেন, "এই মহাবিশ্ব দেখেই বোঝা যায় যে, এর পেছনে একজন নক্সাকার (Designer) রয়েছেন।"

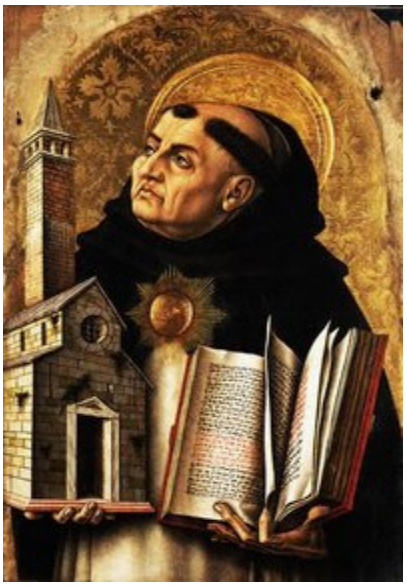

(St. Thomas Aquinas : 1224-1274)

ইটালিয়ান দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৪-১২৭৪) বলেন " এ জগৎ যেন একটি উদ্দেশ্যর রাজত্ব। এখানকার সব বস্তু নিয়োজিত নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে। তাদের এ উদ্দেশ্য সাধনের পেছনে এক বুদ্ধিমান পরিচালকের সংকেত রয়েছে। জগৎ যদি উদ্দেশ্য পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এর একজন পরিচালক থাকা চাই। আর এ মহান পরিচালকই হলেন ঈশ্বর।"

(Gottfried Wilhelm Leibniz : 1646-1716)

জার্মান বাস্তব-ভাববাদী দার্শনিক উইলহেম লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) বিশ্বসংসারের রহস্য ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি **La Monadologie** বা **Monadology** (১৭১৪) গ্রন্থটি রচনা করেন এবং সেখানে **মোনাড** তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। লাইবনিজের মতে,“ বিশ্বের গঠনগত মৌলিক সত্তা হচ্ছে অসংখ্য মোনাড। মোনাড দিয়ে এই বিশ্ব-মহাবিশ্ব গঠিত। কিন্তু এই মোনাড কোন বস্তু নয়, অবিভাজ্য এক অ-বস্তু সত্তা। মোনাড প্রত্যক্ষদর্শী এবং আত্মক্রিয়। কিন্তু এক মোনাডের সঙ্গে অপর কোনো মোনাডের কোনো কার্যকারণগত সম্পর্কের অস্তিত্ব নেই ; তথাপি এক মোনাডের সঙ্গে অপর মোনাড সম্পর্কিত সব মোনাড নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি সুসংহত বিশ্ব। এবং বিশ্বের সুসঙ্গতি পূর্বনির্দিষ্ট। এ যেন সর্বশ্রেষ্ঠ মোনাড বা বিধাতার মধ্যে সঙ্গতি দেখানোর জন্য তারই প্রতিচ্ছায়া ফেলা হয়েছে প্রতিটি মোনাডে। লাইবনিজ বলেন, ঈশ্বর সব মোনাডের স্রষ্ঠা। তিনি আগে থেকেই এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যাতে স্বাধীন হয়েও মোনাডগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারে। এ যেন দুটি ঘড়ির একই সময় নির্দেশ করার মতো। একই সময় নির্দেশকারী দুটি ঘড়ি থেকে আমরা একথা বলতে পারি না যে, এদের একটির যন্ত্রপাতি অপরটির যন্ত্রপাতির উপর ক্রিয়া করছে। বরঞ্চ আমরা জানি যে, এদের এমন ভাবে তৈরি ও চালুকরা হয়েছে যে, শুরু থেকে এরা পূর্বাপর একই সময় নির্দেশ করে যাবে। ঠিক তেমনি জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার মূলে রয়েছে ঈশ্বর।” বস্তুর অস্তিত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য তিনি “**যথোপযুক্ত যুক্তির বিধান**” বা “**Law of Sufficient Reason**” তৈরি করেন। তিনি মনে করেন বিশ্বজগতের ব্যাখ্যার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক আবিস্কার করা; যে বস্তু যেখানে যেমন আছে তার সে অবস্থান অবশ্যই আকস্মিক বা কারণহীন নয়। সে যেখানে আছে সেখানে তেমনভাবে থাকার কারণ আছে। পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে সেই কারণ, কাজেই বিশ্বজগতে কোন বস্তু বা ঘটনাকে অনুপযুক্ত বা অযৌক্তিক বলার উপায় নেই। বস্তু বা ঘটনা মাত্রই যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিতেই তার অবস্থান। কাজেই বলা যায় প্রত্যেকটি বিষয় যুক্তিগ্রাহ্য এবং প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তুই যথার্থ।

জে. মার্টিনোর মতে, জগতে নির্বাচন (**Selection**), সংযোগ (**Combination**) ও স্তরভেদ (**Gradation**)- এ তিনটি ব্যাপারের উপস্থিতিও একজন পরম চেতন বুদ্ধিমান সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এ তিনটি মানদন্ডের নিরিখে সনাক্ত করা যায় এক বুদ্ধিমান মনের কর্মকান্ডকে, যাকে আমরা ঈশ্বর নামে অভিহিত করতে পারি।

তবে দর্শন শাস্ত্রে সবচেয়ে সুন্দর এবং সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণটি ব্যক্ত করেছেন ইংরেজ ধর্মযাজক উইলিয়াম প্যালে (১৭৪৩-১৮০৫) তাঁর **‘ন্যাচারাল থিওলজি’** (***Natural Theology****: Evidences of the Existence and Attributes of the Deity* (1802)) নামক গ্রন্থে।

(*William Paley : 1743-1805*)

প্যালের এই যুক্তিকে দর্শন শাস্ত্রে **Argument from Design** বা "**নক্সা থেকে যুক্তি**" পদ্ধতি নামে পরিচিত। উইলিয়াম প্যালে'র **নক্সা থেকে যুক্তি** পদ্ধতিটি আবার ঘড়ির কারিগড়ের যুক্তি (**Watchmaker Analogy**) নামেও বেশ পরিচিত। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি জোরালো যুক্তি/ প্রমাণ হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে! উইলিয়াম প্যালে তাঁর লিখিত **ন্যাচারাল থিওলজি** (১৮০২ সাল) গ্রন্থেউল্লেখ করেছেন : " ধরা যাক জঙ্গলে পথ চলতে চলতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটি ঘড়ি কুড়িয়ে পেলেন। উনি কি ভেবে নেবেন যে ঘড়িটি নিজে থেকেই তৈরী হয়ে জঙ্গলে পড়ে ছিল, নাকি কেউ একজন ঘড়িটি তৈরী করেছিল? নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধান্ত নিবেন যে, ঘড়িটি কেউ তৈরী করেছিল। একটি ঘড়ি যেমন নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি আমাদের এই বিশ্ব-মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্টি হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। একটি ঘড়ির ডিজাইন ও কলাকৌশল থেকে আমরা যেমন একজন ঘড়ি নির্মাতার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি, তেমনি প্রকৃতি ও জীবজগতের শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা থেকে একজন পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। আর এ পরিকল্পনাকারীই হলেন ঈশ্বর। কারণ এ পৃথিবী একটি ঘড়ির চেয়ে শতগুন বেশি বিচিত্র ও জটিল। আর তাই ঘড়ির অস্তিত্ব থেকে যেমন তার নির্মাতার অস্তিত্ব অনুমেয়, তেমনি এ বিচিত্র জগৎ ও তার জটিল কলাকৌশল থেকেও একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব অবশ্যই অনুমেয়।"

বিগত নব্বইয়ের দশক থেকে বর্তমান সময়ে এই উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণটির মূল বক্তব্যকে ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়েছে "**বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প**" বা **Intelligent Design Argument** সংক্ষেপে আই. ডি'র মাধ্যমে। এই বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের প্রবক্তা এবং প্রচারক হচ্ছেন মার্কিন গণিতবিদ এবং Baylor University এর অধ্যাপক উইলিয়াম আলবার্ট ডেম্বস্কি (**William A. Dembski**), লিহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নবিদ ড. মাইকেল বিহে (**Michael Behe**), ফিলিপ জনসন (**Phillip E. Jhonson**), জোনাথন ওয়েলস (**J. Wells**) সহ প্রমুখ। আই. ডি তত্ত্বের প্রবক্তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে "সূক্ষ্ম সমন্বয় যুক্তি" (**Fine Tuning Arguments**), নরত্ববাচক যুক্তি (**Anthropic Argument**) নামে আরো কয়েকটি যুক্তি জোরেশোরে প্রচার করে চলছেন। তবে তাঁদের মুল বক্তব্য হচ্ছে, "আমাদের এই বিশ্ব-মহাবিশ্ব-ব্রহ্মান্ড এবং

সর্বোপরি জৈবজীবন এতো জটিল এবং অনন্য অসাধারণ যে প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলোর উৎপত্তি হতে পারে না। এর পেছনে স্পষ্টই এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাকারী'র পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে ; যাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানির্ভর ডেটাগুলো দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এবং উচিৎ ও নয়। এই সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার অস্তিত্ব **(Intelligent Agent)** তখনই বুঝা যাবে যখন এর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যর আলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে।" সহজ ভাষায় বলতে গেলে, বর্তমানকালের এ সকল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকনামধারীরা আই. ডি, ফাইন টিউনিং কিংবা অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট দ্বারা মূলত জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান, বিবর্তনবাদের পরীক্ষালব্দ নানা আবিষ্কারকে অস্বীকার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাচ্ছেন ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির জন্যই মহাবিশ্বে এতো আয়োজন করেছেন। এবং মহাবিশ্বেএতো আয়োজনের ঘনঘটা দেখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়!!

## উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি/ প্রমাণ/ বক্তব্য সমূহ খন্ডন :

(১) আর্গুমেন্ট ফর্ম ডিজাইন কিংবা উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জার্মান দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ইমানুয়েল কান্ট (**Immanuel Kant** : 1724-1804) বলেন : "উদ্দেশ্যবাদী যুক্তিটি যুক্তি হিসেবে প্রাচীনতম, স্পষ্টতম এবং তা সাধারণ মানুষের যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সবচাইতে সঙ্গাতিপূর্ণ। তবে এই যুক্তির একটি পূর্ণস্বভাব, সর্বতোভাবে নিঁখুত সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণে এর সীমাবদ্ধতাও অসামান্য। এ যুক্তি বড়জোর একজন জগতের একজন পরিকল্পনাকারীর ইঙ্গিত দিতে পারে ; কিন্তু সেই পরিকল্পনাকারী যে জগতের পরম স্রষ্টা তা প্রমাণিত হয় না। এ ছাড়া এই মহাপরিকল্পনাকারীর যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তারই বা প্রমাণ কী? হতে পারে যে, জগতের উৎস কোন পরম ব্যক্তি নন, বরং নিছক একটি নৈর্বক্তিক শক্তি।"

(২) উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে সহজবোধ্য ব্যাখ্যা প্রদানকারী উইলিয়াম প্যালের 'ঘড়ির কারিগরের যুক্তি'টি অনেকটা সাদৃশ্যানুমানের (Argument from Analogy) উপর নির্ভরশীল। যেমন আমরা সহজেই গাড়ি, বাড়ি, ঘড়ি প্রভৃতি সাধারণ জিনিষের নক্সা এবং এর পরিকল্পনা করতে দেখি এবং দেখাতে পারি ; কিন্তু আমরা যে জগতে বাস করছি তার পরিকল্পনা ও নক্সা করতে কাউকে কখনো দেখিনি, দেখার প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমান জগতের মানুষের তৈরি বস্তুগত নক্সা, শৃঙ্খলা, পরিকল্পিতরূপ ইত্যাদির মাধ্যমে জগতের ও একজন পরম পরিল্পনাকারী'র অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। জগতে যে মোটামোটি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে, তাতে হয়তো সন্দেহ নেই; কিন্তু সেটা পূর্বপরিকল্পিত তা হলফ করে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা যায় না। কারণ, ধরা যাক কয়েকটা পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে মারলে এগুলো অবশ্যই একসময় মাটিতে এসে পড়বে এবং এদের মধ্যে একধরণের শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হবে। আবার কয়েকটি ভারি জিনিসকে উপর থেকে নিচের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেগুলোও মোটামোটি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই পড়বে। এই যে পড়ন্ত অবস্থায় ভারী বস্তু বা পাথরগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, এই শৃঙ্খলায়তো কোনো পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনার ছাপ নেই বরং এই শৃঙ্খলা আকস্মিক এবং এর মধ্যে কোনধরণের পূর্বপরিকল্পিত নিয়ম নেই। এ থেকে কী ধারণা করা যায় না যে, সুদূর অতীতে এক প্রকান্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সবকিছু বিক্ষিপ্ত হয়ে এদের মধ্যে এক ধরণের শৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে

এ জগতের সকল শৃঙ্খলার মূলে একজন চেতন পরিকল্পনাকারী ঈশ্বরের কল্পনা করা অহেতুক নয় কি?

(৩) আমাদের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্ক ও সংস্থান দেখে অনেকে মনে করেন এগুলো আসলেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হয়ে যায় না। এঁরা আরো বলে থাকেন, জগৎ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের শুধু যে শক্তিমত্তা ও নিপুণতারই প্রকাশ ঘটেছে তাই নয়, শিল্প-সৌন্দর্য-সৌকর্য অবিশ্বাস্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। আকাশে ঘননীল মেঘের সমারোহ, পড়ন্ত বিকেল বেলায় ঘনসবুজ মাঠে বাতাসে ধানের শীষের দোল খাওয়া দেখলে যে কারোই হৃদয়ে দোলা দিয়ে ওঠে, কিংবা আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টিতে অনেকেরই মন নেচে ওঠে .....প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অজানাকে জানার, পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। আমাদের এই ব্যাকুল মনের ভাবকে খুব স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

শতবরণের ভাবউচ্ছ্বাস

কলাপের মতো করেছে বিকাশ,

আকুল পরাণে আকাশে চাহিয়া

উল্লাসে কারে যাচে রে।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে

ময়ুরের মতো নাচেরে।

কিন্তু কবি-কল্পনার এই উচ্ছ্বাস ও মোহজাল ছিন্নকরে নির্মোহ দৃষ্টিতে এই প্রমাণটিকে বিচার করলে কিন্তু প্রকৃতির এই আবেদন-নিবেদন অনেকটাই কমে যায়। জগতে যদি সবকিছুতেই মানুষ সৃষ্টির জন্য উদ্দেশ্যময়তা **(Anthropic Argument)** থেকে থাকে তবে উদ্দেশ্যহীনতাও কি কম আছে? এই পৃথিবীতে তো আমাদের জীবনরক্ষাকারী শক্তির পাশাপাশি জীবনধ্বংসকারী দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তির প্রাদুর্ভাব প্রচুর রয়েছে। আমরা জানি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বন্যা, ঝড়, জলচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, দাবানল, রোগ-জীবানুবিভিন্ন ভাইরাস-ব্যকটেরিয়া যেমন প্লেগ, এইডস্, ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকেই ধ্বংসের কারণ। তাহলে এই ধ্বংসলীলা কী এই জগতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যময়তাকে অর্থাৎ **Anthropic Argument**'কে প্রশ্নবিদ্ধ করছে না? এই জগতে নানা ধরনের মন্দ বা খারাপের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, জগতের সবকিছুই মানুষের ভালোর দিকে লক্ষ্য রেখেই ঘটানো হচ্ছে না। আর তাই মানুষ এই জগতে মন্দের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিতে পারে না। আর মন্দই যদি থেকে থাকে তবে বলতে হয়, যদি এই জগৎ সৃষ্টির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেও থাকে তবে আর যাই হোক, মানুষের জন্য মহৎ বলা যায় না।

(৪) মানুষ যখন কোন কিছু সৃষ্টি বা তৈরি করে, তখন যে উপাদানগুলোর সাহায্য নেয়, তাদেরকে মানুষ কিন্তু নিজে সৃষ্টি করে না, বরং মানুষের কাজ কেবল সাহায্যকারী উপাদানগুলোর নিজস্ব আকার বদলিয়ে সেখানে নতুন রূপ দেওয়া। ঈশ্বরের জগতসৃষ্টিও মানুষের কোন কিছু সৃষ্টির মতো একই রকমের কোনো প্রকৃয়া বলে ধরা হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় জগতসৃষ্টির উপাদানগুলোর প্রাক্সৃজনী অস্তিত্ব নিয়ে এবং তার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক নির্ণয় নিয়ে। যে উপাদান দ্বারা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন বলে বলা হয়, সেই উপাদানগুলো কি আগে থেকেই ছিল? আর এরূপ মনে করলে ঈশ্বরের স্বরূপগত ঐক্য, সর্বশক্তিমানতা ও

মহিমা ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। আবার মানুষ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করে বা তৈরি করতে চায় তখন যে উপাদানটি সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়, তার (উপাদানটি) মধ্যে একটা প্রতিরোধ শক্তি থাকে, যা তাতে নতুন রূপারোপে বাধা দেয় (উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মানুষ যখন একটি পাথর ভেঙ্গে মূর্তি তৈরি করতে যায়, তখন পাথটির অভ্যন্তরীণ আণবিক গঠন তাতে বাধা দেয় এবং এরপরও যথেষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে আণবিক গঠন ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে পাথরটিও ভেঙ্গে যায়।)। যিনি এই প্রতিরোধশক্তি যত বেশি জয় করতে পারেন, তিনি তত বড় স্রষ্টা ও শিল্পী। জগৎ সৃষ্টির উপাদানসমূহ যদি পূর্ব হতেই অস্তিত্বশীল ছিল বলে মনে করি, তাহলে সেই উপাদানের মধ্যেও এই নিজস্ব প্রতিরোধশক্তি ছিল। এখন যদি ঈশ্বর অসীম শক্তিবলে উপাদানসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তি জয় করে তাতে এই জগতের রূপটি আরোপ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন আসে স্রষ্টারূপে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি? কোনো পার্থক্যতো রইলো না।

(৫) সাধারণত আমরা জানি যে, কোনো উদ্দেশ্য যখন কোনো কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, সেটি তার বাইরে থেকে কর্মকর্তার মনের ইচ্ছা অভিপ্রায় রূপে থাকে। ফলে যে কর্মের দ্বারা কোনো উদ্দেশ্যকে চারিতার্থ করতে চাওয়া হলো, সেটির সঙ্গে উদ্দেশ্যটির কোনো অন্তর্নিহিত অন্তর সম্পর্ক থাকে না, তা শুধুই একটি বাইরের সম্পর্ক হয়ে থেকে যায়। তাহলে জগৎ সৃষ্টি করে ঈশ্বর যে উদ্দেশ্য (মানুষ সৃষ্টি) চরিতার্থ করতে চেয়েছেন, তাও থাকছে এর বাইরে ঈশ্বরের মনের কোনো গূঢ় অভিলাস বা বাসনার রূপ ধরে এবং জগতের সঙ্গে ঈশ্বের সম্পর্ক থাকছে শুধুমাত্র একটা বাইরের সম্পর্ক হিসেবে; অন্তর্নিহিত কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়াও ঈশ্বরের সাথে জগতের বাহ্যিক সম্পর্কের মানে দাঁড়ায় ঈশ্বর এই জগৎ থেকে আলাদা কোনো সত্তা। এবং ঈশ্বর যদি এই জগৎ থেকে আলাদা কোনো সত্তা হন তাহলে ঈশ্বরের সর্ববিরাজমানতা বা সর্বব্যাপকতা **(Omnipresence)** গুণাবলীটি ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

(৬) এবার সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা যাক উইলিয়াম প্যালের সেই বিখ্যাত "**ঘড়ির কারিগরের যুক্তিটি**" **(Watchmaker analogy)**। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **Dr. Richard Dawkins** তাঁর বিখ্যাত "***The Blind Watchmaker : Why the evidence of Evolution reveals a universe without design*** **(Pub: w.w. Norton & Company ; 1986)**" গ্রন্থে এই '**ঘড়ির কারিগরের যুক্তি**'টির অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "একটি ঘড়ির যেমন ঘড়ির কারিগর থাকে, তেমনি সেই কারিগরেরই থাকে পিতা। তাহলে এই বিশ্ব-মহাবিশ্বের কারিগররূপী ঈশ্বরের পিতা কে? আর সেই ঈশ্বরের পিতারই বা পিতা কে, আর তার পিতা?" এই ধরণের প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক এবং এমনভাবে প্রশ্নের ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদেরকে ঠেলে দিবে অন্তহীন অনন্তপ্রশ্নের দিকে। যার কোনো উত্তর পৃথিবীর তাবৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসীরা দিতে পারেন না। ফলে এই ধরণের প্রশ্নের হাত থেকে রক্ষা পেতে কিংবা সহজে গা ঢাকা দেওয়ার জন্য তারা সোচ্চারে বলতে থাকেন " ঈশ্বর স্বয়ম্ভু। তিনি অনাদি-অসীম। তার কোনো পিতা নেই, উদ্ভবের কোনো কারণও নেই।" এই ধরনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা প্রশ্ন চলে আসে "ঈশ্বর যে স্বয়ম্ভু, তা আপনারা জানলেন কিভাবে? নিজে জেনেছেন না অন্য কেউ কি আপনাদের জানিয়েছেন? আর যদি অন্য কেউ জানিয়েই থাকেন, তবে তাঁর জানাই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ বা যুক্তি কি? আবার যে যুক্তিতে **(God is the first cause of all causes)** ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভু-অনাদি-অসীম বলে ভাবা হচ্ছে, একই যুক্তিতে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মান্ডকে স্বয়ম্ভ-অনাদি-অসীম বা সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই উৎপত্তি ঘটেছে- ভাবতে অসুবিধা

কোথায়? অনেক আগেই উইলিয়াম প্যালের "ঘড়ির কারিগরের যুক্তি" কিংবা প্রায় একইধরনের অন্যান্য যুক্তিগুলোর শুভঙ্করের ফাঁকিটি ধরতে পেরেই স্কটিস দার্শনিক **David Hume** (1711-1776) তাঁর ***Dialogues Concerning Natural Religion*** **(ed. N. K. Smith, Edinburgh, 1947)** গ্রন্থে বলেছিলেন " পৃথিবীর আদি কারণ যে এক ও অদ্বিতীয় হবেই হবে, এ নিশ্চিত ঘোষণা আমরা দেবো কিসের ভিত্তিতে? এমনও তো হতে পারে যে, আসলে আদিকারণ একটি নয়, একাধিক। ..... আমরা কী বলতে পারি না, জগতের প্রত্যেক জিনিসেরই একটা কারণ আছে এবং সেই কারণেরও একটা কারণ আছে? তাই যদি হয়, তাহলে কার্য ও কারণের ধারা অবিরাম ও অনির্দিষ্টভাবে চলতেই থাকবে, যার ফলে আর আদি কারণে বিশ্বাসের প্রশ্নই উঠবে না।" এ ব্যাপারে প্রায়ই একই বক্তব্য রেখেছিলেন **Bertrand Arthur William Russel (1872-1970)** তাঁর ***A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz: With an Appendix of Leading Passages (Routledge, 1993)*** গ্রন্থে। তাছাড়াও দর্শন শাস্ত্রে"**Burden of Proof**" বলে একটি সূত্র প্রচলিত আছে; যার অর্থ হচ্ছে "**কোন বক্তব্যের দাবিদারকেই তার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে হবে।**" তাই বলা যায় যে, ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকেই আগে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে হবে এবং ঈশ্বর যে সবকিছুর আদি কারণ তারও প্রমাণ বিশ্বাসীদেরকেই প্রথমে উপস্থাপন করতে হবে।

(৭) উইলিয়াম প্যালে **ন্যাচারাল থিওলজি** (১৮০২) গ্রন্থে বলেছেন : ".....একটি ঘড়ি যেমন নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি আমাদের এই বিশ্ব-মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্টি হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ....." এই ধরনের সাদৃশ্যানুমানের **(Argument from Analogy)** উপর নির্ভরশীল বক্তব্যের আরো কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। যেমন আমাদের সমাজে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি বাড়ি বানায় বাড়ির কারিগর (রাজমিস্ত্রি), সোনা বানায় বা কাজ করে স্বর্ণকার, জুতার বানায় বা কাজ করে জুতার কারিগর যাদের আমরা প্রচলিত ভাষায় মুচি বলে অভিহিত করি, নৌকা চালায় এবং বানায় মাঝি, আমাদের পোষাক বানায় দর্জি ইত্যাদি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের সমাজে প্রত্যেকের পেশা আলাদা, এবং একজন নির্দিষ্ট লোক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি মাত্র কাজ করতে পারে। দুনিয়ার কোনো একক ব্যক্তিই দুনিয়ার সব কাজ করতে পারে না এবং তার দ্বারা সম্ভবও নয়। তাহলে ঘড়ির কারিগরের যুক্তির সাথে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, এই পৃথিবীর জন্য দরকার একজন পৃথিবীর কারিগর, সূর্যের জন্য দরকার সূর্যের কারিগর, চন্দ্রের দরকার চন্দ্রের কারিগর, উল্কা-ধূমকেতুর জন্য দরকার উল্কা-ধুমকেতুর কারিগর, পৃথিবীর জোয়ার-ভাটা'র জন্য দরকার জোয়ার-ভাটার কারিগর, বৃষ্টির জন্য দরকার বৃষ্টির কারিগর। এরকম ভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের জন্য অসংখ্য কারিগর। কিন্তু মহাবিশ্বের সাথে ঘড়ির তুলনা দিলেও বিশ্বাসীরা সবশেষে যুক্তিহীনভাবে একজনমাত্র সর্বশক্তিমান, সর্ববিরাজমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। আমাদের এই আকাশগঙ্গা সৌরজগতের বাইরেও আরো অনেক সৌরজগতের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা লাভ করেছেন। তাহলে বলতে হয়, সেই সকল সৌরজগতের জন্য একাধিক ঈশ্বর বা বহুঈশ্বর থাকতে বাঁধা কোথায়? কিন্তু একঈশ্বরবাদী **(Monotheist)**'দের কাছে বহু ঈশ্বরবাদ **(Polytheism)** আবার একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র। আর সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে টোটেমবাদ **(Totemism)**, সর্বপ্রাণবাদ **(Animism)**,

বহুঈশ্বরবাদ (**Polytheism**) এর পরে একঈশ্বরবাদ (**Monotheism**) ধর্মীয় বিবর্তনের একটি ধাপ মাত্র।

(৮) উইলিয়াম প্যালে হয়তো ধরে নিয়েছিলেন একটি ঘড়ির গঠন জটিল কিন্তু এর কাজ সুশৃঙ্খল এবং আমাদের এই মহাবিশ্বের গঠনও জটিল কিন্তু এর ঘটনা প্রবাহ সুশৃঙ্খল, তাই ঘড়ি এবং মহাবিশ্বের মধ্যে তুলনা করা যায়। এবং ঘড়ির যেহেতু একজন কারিগর থাকতে বাধ্য ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বেরও একজন কারিগর থাকতে বাধ্য। কিন্তু আমরা জানি ঘড়ি, বাড়ি, জুতা বানানোর জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন তা আমাদের প্রকৃতিতেই বিদ্যমান। যেমন ঘড়ির তৈরির উপাদান হচ্ছে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, প্লাস্টিক, ইত্যাদি; বাড়ি তৈরির জন্য লাগে রড, সিমেন্ট, বালুইত্যাদি; জুতা বানানোর জন্য লাগে চামড়া, র-, সুতা ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা বলে থাকেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নাকি আমাদের এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন একদম শূন্য হতে। তাহলে তো ঘড়ির কারিগরের সাথে মহাবিশ্বের কারিগরের মিল খোঁজার চেষ্টাটি একটি ভ্রান্ত প্রচেষ্টা। যাই হোক, ঘড়ির গঠনের সাথে মহাবিশ্বের গঠনের ভূলভাবে সাদৃশ্য করা হয়েছে। এই ভুল সাদৃশ্যটির একটি চমৎকার ব্যাখ্যা মুক্তমনা ওয়েবসাইটের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায়ের লেখা "**আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী**" (২০০৫) নামক গ্রন্থ (পৃষ্ঠা- ৮৪) থেকে তুলে ধরছি :

ক। ঘড়ির গঠন জটিল

খ। ঘড়ির জন্য একজন কারিগর দরকার।

গ। মহাবিশ্বের গঠনও জটিল

ঘ। সুতরাং মহাবিশ্বের জন্য একজন কারিগর আবশ্যক।

শেষ পদক্ষেপটি ভুল। কারণ, এটি এমন একটি উপসংহারের দিকে আমামদের নিয়ে গেছে যা বিচারের নীতি বা নির্ণায়ক দ্বারা সমর্থিত নয়। উপরের যুক্তিটির ভুলটি নীচের আরেকটি উদাহরণের সাহায্যে আরো ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায় :

ক। পাতার গঠন জটিল

খ। পাতা গাছে জন্মে।

গ। টাকার হিসাবের (**Money bills**) গঠনও জটিল

ঘ। সুতরাং টাকা গাছে জন্মায় (এটি প্রবাদে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে ঘটে না)।

(৯) আমরা আগেই বলেছি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যবাদী প্রমানটি (**Teleological Argument**) সহজ সরল, মনযোগ আকর্ষক এবং বেশ পুরনো। সমাজ, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতি জায়গায় এখনও এই প্রমানটির প্রাদুর্ভাব রয়ে গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে উদ্দেশ্যবাদী মতের দৌরাত্মে দীর্ঘ প্রায় বারশো' বছর ধরে সিন্দবাদের ভূতের মতো চেপে বসেছিল গ্রীক-মিশরীয় গণিতবিদ টলেমি (Claudius Ptolemy : 90-168)'র ভূ-কেন্দ্রিক (**Geocentric**) প্রকল্প, যা আসলে প্রকান্তরে নরত্ববাচক বা **Anthropic Argument**। বিজ্ঞানী টলেমির ভাষ্য ছিল সমস্ত সৌরজগতের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী, এবং সূর্যসহ অন্যান্য সকল গ্রহগুলি পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। শুধু বিজ্ঞানী টলেমিই নন; গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত অ্যারিস্টটল (**Aristotle : 384-322 BC**) ও মনে করতেন, "পৃথিবী স্থির এবং অবস্থান করছে সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে;

আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত চক্কর দিয়ে চলছে চন্দ্র, সূর্য, বুধ, বৃহস্পতি, শনি সহ অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্ররাজি।" এই ধরণের ভূকেন্দ্রিক মতবাদ (**Geocentric view**) গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের শিক্ষক প্লেটো (**Plato : 427-347 BC**) ও তাঁর ছাত্রদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন। সুদীর্ঘ কাল ধরেই টিকেছিল এই অন্ধবিশ্বাসের অচলয়াতন। পরবর্তীতে পোলিশ জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস (**Nicolas Copernicus : 1473-1543**) তত্ত্ব-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আরো অন্যান্য গ্রহের মতোই আবর্তিত হচ্ছে। কোপার্নিকাসের এই সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ (**heliocentric View**)টিকে পরে জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২), জোহান্নেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) বৈজ্ঞানিকভাবে শক্তিশালী করেন। কিন্তুপ্রশ্ন আসে সৌরজগতের কেন্দ্রে পৃথিবী রয়েছে এই ধরনের বিশ্বাস বা মনোভাব টলেমিসহ অন্যান্যদের মধ্যে কিসের জন্য তৈরি হয়েছিল। এটা কী অবচেতন-চিন্তার সেই অন্ধ-বিশ্বাস নয়, যে ঈশ্বরের সৃষ্টি পৃথিবী হলো মানুষের আবাসস্থল আর মানুষই হলো যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম? ফলে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবাসস্থল তো আর অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্ররাজিকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করতে পারে না, তাই পৃথিবী স্থির এবং অন্যান্য যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্ররাজি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে!!

(১০) উদ্দেশ্যবাদী মতবাদ শুধু যে মানুষের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী তাই নয়, এই বিশ্বাসটিও রয়েছে ঈশ্বর জগতে যা কিছু করেছেন তা এই মানুষের জন্যই করেছেন। এজন্যই হয়তো মোটামোটি সব ধর্মই বলেছে, ঈশ্বর তাঁর নিজের মতো করে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন আসে, কিসের জন্য ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছিলেন? এই জগতে কি মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব নেই? এটা কি প্রমাণ করার জন্য যে- (ক) মানুষ জীব হিসেবে জড় থেকে পৃথক , (খ) অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের জৈবিক পার্থক্য একেবারে মূলগত? এরকম হলে, বলতে হয় জগতের পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মানুষের জন্য। এবং ঈশ্বর যদি মানুষকে তাঁর নিজের মতো করে সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে বুঝা যায় :- **(i)** পৃথিবীর উৎপত্তির পর মনুষ্য প্রজাতি জন্ম লাভ করার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তকোন ধরনের দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি মানুষের? **(ii)** মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ধ্যানধারণাগুলো প্রথম থেকেই এখনকার মতো ছিল? কিন্তু এ ধরনের ধারণা মোটেও সঠিক নয়। সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে মানুষ জানতে পেরেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক নীতিনৈতিকতা, ধ্যানধারণা কখনোই এরকম ছিল না। সময়ের ধারাবাহিকতায় পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে নীতিনৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণাগুলী ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে চলছে। এবং উদ্দেশ্যবাদীদের মানুষের দৈহিক অপরিবর্তনশীল মনোভাব **Charles Darwin** (1809-1882) এর **ক্রমবিকাশ তত্ত্ব**(***Evolution Theory*** বা বিবর্তনবাদ) ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর ***On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured races in the struggle for life*** (1859) এবং ***The Descent of man and Selection with respect to Sex*** (1871) গ্রন্থে অকাট্য সব প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে স্বরূপগত প্রভেদের ধারণার মূলে কোনো সত্যই নেই। তিনি মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মধ্যবর্তী হারানো যোগসূত্রটি খুঁজে পেলেন এমন এক জীবের মধ্যে, যা আধামানুষ, আধাবানর। ডারউইন তাঁর গ্রন্থের মধ্য

বিভিন্ন উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখালেন মানুষের সাথে অন্যান্য নিম্নস্থরভুক্ত (মূলত যাদের আমরা প্রথাগত কারণে নিম্নস্থরভুক্ত বলে প্রায়ই অভিহিত করে থাকি; যেমন- গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বেবুন, ওরাং ওটাং প্রভৃতি) প্রাণীদের সাথে জৈবিক পার্থক্য তেমন নেই। বর্তমানে যা আছে, তা দীর্ঘদিনের প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) প্রকৃয়ার মাধ্যমে অভিযোজন (Adaptation) ঘটার ফলে। ডারউইন তাঁর "**ডিসেন্ট অফ ম্যান**" (১৮৭১) গ্রন্থ দ্বারা আমাদের মানব জাতির ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা "আশরাফুল মাকলুকাত" এর অচলায়তনকে গুড়ো করে দিলেন। আধুনিক কালে ডারউইনের বিবর্তন বিদ্যা বিজ্ঞানের অনেক শাখায় বিকশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে ; মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীদের বিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানের সেই সকল শাখা নানা তথ্য প্রদান করছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শাখার নাম উল্লেখ করা যায় ; যেমন : প্রাইমেটবিদ্যা (Primatology), ভূতত্ত্ব (Geology), প্রত্নজীববিদ্যা (Palaeontology), বংশগতিবিদ্যা (Genetics), কোষ বংশগতিবিদ্যা (Cytogenetics), আণবিক জীববিদ্যা (Molecular biology)'র নাম উল্লেখযোগ্য। এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটপ বিকিরণের (পটাশিয়াম-আর্গন পদ্ধতি) ভিত্তিতে দেখা গেছে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন, প্রাচীনতম এককোষী জীব প্রায় ৪.০ বিলিয়ন, স্থলজ প্রথম জীব প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন, প্রথম স্তন্যপায়ী জীব প্রায় ২০০ মিলিয়ন, প্রথম প্রাইমেট (Primates) প্রায় ৬৫ মিলিয়ন, প্রথম এপ (Ape) প্রায় ৩০ মিলিয়ন, প্রথম হোমিনিড (Hominid) প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন, ও প্রথম মানুষ প্রায় ০.১ মিলিয়ন বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে উদ্দেশ্যবাদী মত যা বলছে , আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আজকের মানুষ পৃথিবীর উৎপত্তির প্রথম থেকেই একই রকম অবস্থায় ছিল না ; এককোষীজীব হতে দীর্ঘ এক পরিবর্তনশীল ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আজকের ক্রো-ম্যাগনন (**Cro-magnon**) মানুষে এসে পৌঁছেছে। এবং আজকের এই ক্রো-ম্যাগনন যে মানব প্রজাতির সর্বশেষ স্থর, তাও নয়। বিবর্তন এখনও চলছে .....।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, উদ্দেশ্যবাদী মতবাদ অনুসারে এ জগৎ একটি উদ্দেশ্যর রাজত্ব এবং সেই উদ্দেশ্য একমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক এবং বাস্তব জ্ঞান থেকে আমরা দেখতে পাই এ জগতে ভালো-মন্দ, উদ্দেশ্যময়তা- উদ্দেশ্যহীনতা দুটোই সমান সত্য এবং এ জগতে বিদ্যমান। তাই বলা যায় যে, এই উদ্দেশ্যবাদী প্রামাণটির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও সর্বসম্মত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

.....ক্রমশ.....

**<u>প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের তথ্যসূত্র</u>** :

(১) ড. আমিলুল ইসলাম ; জগৎ জীবন দর্শন ; প্রকাশ : ১৯৯২; বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০।

(২) আনিন্দ্য আর্য্য ; ঈশ্বর বিতর্ক ; প্রকাশ : ১৯৯৭ ; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০।

(৩) অভিজিৎ রায় ; আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী ; প্রকাশ : ২০০৫ ; অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০।

(৪) **http://www.philosophypages.com**

(৫) **http://apologetics.johndepoe.com/teleo.html**

(৬) **http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Design**

(৭) **http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_poor_design**

(৮) অভিজিৎ রায় এবং বন্যা আহমেদ ; ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : আমেরিকায় সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন; **http://www.mukto-mona.com**

(৯) ড. ম. আখতারুজ্জামান ; বিবর্তনবিদ্যা ; প্রকাশ : ১৯৯৮ ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০।